এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক
বাংলাদেশ

আইনের কথা

মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা
কুষ্টিয়া

সম্পাদনায় ঃ
মমতাজ রুমী

সম্পাদনা সমন্বয়কারী ঃ
ফায়িযা রায়হান

সম্পাদনা সহযোগি ঃ
কাজী শফিউল্লাহ
মনোয়ার আহ্‌মেদ
জায়েদুল হক মতিন
সাহানা আক্তার

কম্পিউটার এডিটিং ও কম্পোজ ঃ
তৌহিদা জান্নাতী সোহেলী

মুদ্রণে ঃ
গড়াই প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস লিঃ

প্রকাশনায় ঃ
প্রশিক্ষণ ইউনিট।

মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা
৪৫/১৪, আর,এ,খান চৌধুরী রোড,
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।
ফোন ঃ ৫৫৪২৩ (অফিস),
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৭১-৫৫৪২৩,
Email : Mukti@kushtia.com

সম্পাদকীয় ঃ

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা আইন সহায়তা বিষয়ে কাজ করে আসছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এ ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে যে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যৌতুকের কারণে অনেক বিবাহিতা নারীকে নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে, দরীদ্র বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, এছাড়াও ঘরে বাইরে নারী নির্যাতন চলছে, হত্যা ধর্ষণ এসব এখন নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দেশে যৌতুক ও নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইন তৈরী করা হয়েছে, তারপরও নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না বৈষম্য বেড়েই চলেছে।

একটা সুশীল সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বিলোপ করতে। দেশের প্রচলিত আইন সম্বন্ধে বেশীর ভাগ মানুষেরই তেমন কোন ধারণা নাই। তাই আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, সভা সমিতি করে, আইন সহায়তা দিয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। সেই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায়, এডিবি বাংলাদেশের সহযোগিতায় আমাদের আজকের প্রয়াস এই আইন বিষয়ক বুলেটিন। এই বুলেটিনে সংক্ষিপ্ত ভাবে আইনের যে সব দিক তুলে ধরা হয়েছে তাতে বিয়ে, দেনমোহর, তালাক, ভরণ পোষণ, পারিবারিক আইন ও নির্যাতন প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে মানুষের যেসব ভূল ধারণা ও অসংগতি রয়েছে, কিছুটা হলেও তা দূর হবে বলে মনে করি।

আপনাদের কাছ থেকে আমরা সুচিন্তিত মতামত আশা করছি। আপনাদের পরামর্শ গুলো পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের চেষ্টা করবো।

মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা

পারিবারিক আইন

পরিবার কি ?

স্বামী এবং স্ত্রী নিয়ে একটি পরিবার আবার ব্যাপক অর্থে বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, নিয়ে একটি পরিবার হয়।

আইন কি ?

আইন হলো একটি বিধান যা রাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত, যে বিধান মানব জীবনের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করে অন্যায়-অনাচারকে দুর করে। যে সমস্ত নিয়ম কানুন ভংগ করলে বা না মেনে চললে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হয় তাই আইন।

পারিবারিক আইন ঃ

- পরিবারকে সুষ্ঠু, সুন্দর রাখার বিধি বিধানই পারিবারিক আইন।
- পরিবারকে সুন্দর করতে হলে, বিয়ে, দেন-মোহর, তালাক, বহু বিয়ে, বাল্য বিয়ে, যৌতুক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ভালো মতো জানা দরকার, আর এগুলো পারিবারিক আইনের পর্যায়ে পড়ে।

বিবাহ

- বিয়ে হলো একটি আইনি চুক্তি, যা দেওয়ানী আইনের মধ্যে পড়ে।
- এই চুক্তি দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক নারী ও পুরুষের একসাথে বসবাস এবং জীবন যাপন করার মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত।

বিয়ে তিন প্রকার ঃ

(১) বৈধ/নিয়মিত বিয়ে, (২) অনিয়মিত বিয়ে, (৩) অবৈধ বিয়ে।

(১) বৈধ/নিয়মিত বিয়ে

পবিত্র কোরানে যাদের সাথে বিবাহ করা যায়েজ বলে বর্ণনা হয়েছে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট শর্ত মেনে বিয়ে করাই বৈধ বিয়ে।

একটা ছড়ার সাহায্যে দেখা যাক।

বিয়ে মানে আর কিছু নয়
বিয়ে মানে চুক্তি
বিয়ের আছে ৫টি শর্ত
তারও আছে যুক্তি।

বিয়ের ৫টি শর্ত ঃ

(১) সম্মতি (২) বয়স (৩) দেনমোহর (৪) সাক্ষী (৫) রেজিষ্ট্রেশন ।

* এই ৫টি শর্ত মেনে বিয়ে করলে তাকে বৈধ/নিয়মিত বিয়ে বলে,

(২) অনিয়মিত বিয়ে

অনিয়মিত বিয়ে ঃ- বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু আইনগত নিষেধাজ্ঞা আছে কিছু সাময়িক, কিছু স্থায়ী, সাময়িক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিয়ে করলে তা অনিয়মিত বিয়ে হবে, তবে পরে উক্ত শর্ত পালন করলে তা বৈধ/নিযমিত বিয়ে হয়ে যাবে।

বৈধ/নিয়মিত বিয়ের শর্তগুলো নিম্নরুপ ঃ

(১) **সম্মতি ঃ** বিয়েতে বর ও কনে অর্থ্যাৎ ছেলে ও মেয়ের সম্মতি থাকতে অর্থ্যাৎ বিয়েতে মত আছে, থাকতে হবে।

(২) **বয়স ঃ** মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী ছেলের বয়স ২১ বছর এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর থাকতে হবে।

(৩) **দেনমোহর ঃ** বিয়ের চুক্তিপত্রে অবশ্যই দেনমোহরের টাকার কথা উল্লেখ থাকতে হবে। এই দেনমোহর অবশ্যই পরিশোধিত হতে হবে।

(৪) **সাক্ষী ঃ** বিয়ের চুক্তি দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিস্ক মানুষের উপস্থিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। মেয়ে পক্ষকে সব সময় কাছের আত্মীয়কে সাক্ষী রাখতে হবে। যেমন ঃ মামা, চাচা, ফুফা, খালু, ইত্যাদি, যাতে করে ভবিষ্যৎ এ কোন সমস্যা হলে তারা সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থিত হতে পারে এবং বিয়ের বৈধতা সম্পর্কে বলতে পারে।

(৫) **রেজিষ্ট্রেশন ঃ** রেজিষ্ট্রেশন হলো বিয়ের চুক্তি সমূহকে আইনগত ভাবে সরকারী নথিপত্রে (কাগজে) লিপিবদ্ধ করা। বিয়ের চুক্তি সমূহ অবশ্যই কাজী অফিসে যেয়ে অথবা কাজীকে দিয়ে অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন (নিবন্ধন) করাতে হবে। ইহা মেয়ে পক্ষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন মোল্লা, ইমাম দ্বারা বিয়ে পড়ানো অনুচিত, নিকাহ্ নামা রেজিষ্ট্রেশন করানোর পর অবশ্যই তার কপি তুলে এনে মেয়ে পক্ষের কাছে রাখতে হবে, কেননা নিকাহ্ নামাই আগামীতে তার জীবনে কোন সমস্যা দেখা দিলে, আইন আদালতে তাকে সহায়তা প্রদান করবে।

(৩) অবৈধ বিয়ে।

* যে ধরনের বিয়ে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় তাদের বাতিল বা অবৈধ বিয়ে বলে।

যেমন ঃ-

(১) বিয়েতে কোন স্বাক্ষী না থাকলে।

(২) আইন অনুমোদিত সংখ্যার চাইতে বেশী সংখ্যাক বিয়ে করলে।

(৩) ইদ্দত পালন করেছে এমন কোন মহিলাকে বিয়ে করলে।

(৪) প্রতিমা উপাসিকাকে অর্থ্যাৎ ভিন্নধর্মীয় কোন মহিলাকে বিয়ে করলে।

এমনকিছু সম্পর্ক আছে যাদের মধ্যে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে নিষিদ্ধ যেমন ঃ

(১) রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কাউকে বিয়ে করলে, (মামা-ভাগ্নে)

(২) অপর কোন ব্যাক্তির স্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় তাকে বিয়ে করলে।

(৩) কোন স্ত্রী এক স্বামী থাকাকালীন অন্য বিয়ে করলে।

(৪) পালিত সম্পর্ক আছে এমন কাউকে বিয়ে করলে যেমন পালিতা কন্যা।

বাল্য বিবাহ

ছেলের বয়স ২১ বছর এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর, এই নিয়মের বাইরে ছেলে বা মেয়ের কারও বয়স কম থাকলে উভয়ের মধ্যে বিয়ে সম্পন্ন হলে তাকে বাল্য বিয়ে বলা হবে। এক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে যাবে তবে তা আইনত অপরাধ হিসাবে গন্য হবে, এক্ষেত্রে অভিভাবক দ্বয়ের, ঘটকের কাজীর অর্থ্যাৎ যিনি বিয়ে পড়িয়েছেন অর্থ্যৎ মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির সাজা হবে। যদি কোন সাবালক পুরুষ নাবালক নারীকে বিয়ে করে তবে ঐ পুরুষেরও সাজা হবে।

১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী সাজা ১(এক) মাস বিনাশ্রম জেল অথবা ১০০০/-এক হাজার টাকা জরিমানা। অথবা উভয় দন্ড হতে পারে। বাল্য বিয়ের ক্ষতিকর প্রভাব মেয়ের উপরই পড়ে বেশী, এতে করে মেয়ের স্বাস্থ্যহানী ঘটে, শরীর ভেঙ্গে যায়। বিভিন্ন অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হয়। অপুষ্ট শিশুর জন্ম হয়, বিকলঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। প্রসবকালীন সময় মা মারা যেতে পারে, মৃত সন্তান জন্ম নিতে পারে, স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে, সংসারে অশান্তি নেমে আসে। অধিক সন্তান জন্ম নেয়ার কারণে সন্তানদের পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। এজন্য আইন নয়, সচেতনতার মাধ্যমে বাল্য বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব।

বহু বিবাহ

এক স্ত্রী বর্তমান থাকাকালীন, অন্য কোন নারীকে বিয়ে করলে তাকে বহু বিয়ে বলে। ইহাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তবে কোন স্ত্রীর সম্মতিক্রমে স্বামী বহু বিয়ে করতে পারে তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীকে চেয়ারম্যান এবং স্বাক্ষীদের সামনে ১ম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে। বহু বিয়ে যেহেতু আইনগত অপরাধ সেহেতু এর শাস্তি ১ বছরের বিনাশ্রম জেল এবং ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড হতে পারে। বহু বিয়ের ফলে সংসারে অশান্তি নেমে আসে, সব সময়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ লেগে থাকে, আর্থিক অনটন দেখা দেয়, অধিক সন্তান জন্ম নেয়, দাম্পত্য বিচ্ছেদ দেখা দেয়, তালাকের মাত্রা বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে পুরো পরিবারের উপর এক অশান্তির ঝড় প্রতিনিয়ত চলতে থাকে সেক্ষেত্রে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, ছেলে মেয়েরা অমানুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

তালাক

বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্ক আইনসিদ্ধ উপায়ে ভেঙ্গে দেওয়াকে তালাক বা বিচ্ছেদ বলে।

তালাক দেওয়ার নিয়ম ঃ

স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে স্ত্রীকে নোটিশ দিতে হবে, ঐ নোটিশের কপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে দিতে হবে, চেয়ারম্যান সাহেব নোটিশ পাবার ৩০ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষকে ডেকে সালিশ কমিটির মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মিমাংসা করার চেষ্টা করবেন। তিনমাস অর্থ্যাৎ পরপর তিনটা নোটিশ পাঠানোর পরও যদি মিমাংসা না হয়, তাহলে ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। এই ৯০ দিনকে ইদ্দত কালীন সময় হিসাবে বিবেচিত করা হয়।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবে, পরবর্তীতে তালাক রেজিষ্ট্রেশন করিয়ে নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে স্ত্রী গর্ভবতী থাকাকালীন সময়ে তালাক কার্যকর হবেনা। তালাক বিধি মোতাবেক না হলে, স্ত্রী পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারবেন। স্বামী দোষী প্রমানিত হলে ১বছর জেল ও ৫০০০/= টাকা জরিমানা হবে অথবা উভয়দন্ড হতে পারে।

যে সব কারণে স্ত্রী, স্বামীকে তালাক দিতে পারে ঃ

১। স্বামী যদি ৪ বছর স্ত্রীর খোজ খবর না নেয়।

২। ২বছর পর্যন্ত স্ত্রীকে ভরণ পোষন না দেয়।

৩। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ২য় বিয়ে করে।

৪। ৭বছর বা তার বেশী জেলে আটক থাকে।

৫। পাগল হয়।

৬। যৌন রোগে ভোগে, পুরুষত্বহীন হয়।

৭। খারাপ মেয়েদের সাথে মেলামেশা করে।

৮। স্ত্রীকে অসামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য করে।

৯। স্ত্রীকে যদি ধর্মীয় কাজে বাধা দেয়।

১০। ৪ মাস কোন কারণ ব্যতিরেকে স্ত্রী সহবাস হতে বিচ্ছিন্ন থাকে।

বিঃ দ্রঃ - * তালাক হয়ে যাবার পর স্বামী স্ত্রী পুনরায় যদি সংসার করতে চান তা হলে, পুনরায় বিয়ে করে সংসার করতে পারবেন, হিল্লা বিয়ের প্রয়োজন হবে না। হিল্লা বিয়ে আইনত নিষেধ।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বলে এই নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে।

* নিকাহ্ নামার ১৮নং ঘরটি এইজন্য পুরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ঘরে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পন করেছে কিনা শব্দটি লেখা থাকে। এখানে অবশ্যই হাঁ, যেকোন শর্তে লিখতে হবে।

* বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুত্র সন্তান ৭ বছর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তান সাবালিকা হওয়ার আগ পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে।

হিন্দু পারিবারিক আইনে বিবাহ ও তালাক

বিয়ে কি ?

হিন্দু আইনে বিয়ে একটা ধর্মীয় আচার। হিন্দু বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীরুপে দু'জন নর-নারীর একত্রে বসবাস করা বা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করা।

বিয়ে কত প্রকারের হতে পারে ?

প্রাচীন হিন্দু সমাজে অনেক ধরণের বিয়ে প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে অনুমোদিত বিবাহ : ক) ব্রাহ্ম বিয়ে, খ) দৈব বিবাহ, গ) আর্য্য বিবাহ, ঘ) প্রজাপত্য বিবাহ।

অঅনুমোদিত বিবাহ : ঙ) গান্ধর্ব বিবাহ, চ) অসুর বিবাহ, ছ) রাক্ষস বিবাহ, জ) পৈশাচ বিবাহ। বর্তমানে বাংলাদেশে দুই ধরণের বিয়ে প্রচলিত আছে। বিয়ে দুটি হলো ব্রাহ্ম বিয়ে ও আসুর বিয়ে।

ব্রাহ্ম বিয়ে ঃ

কন্যার পিতা মাতা অথবা অভিভাবক পাত্রের নিকট উপহার সামগ্রীসহ কন্যাকে সম্প্রদান করেন এবং পাত্র কন্যাকে পত্নীরুপে গ্রহণ করে। হিন্দু আইন মতে বিবাহ উভয় পক্ষের একই বর্ণের হতে হবে। আধুনিক কালে এর কিছুটা শিথিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সগোত্র কিম্বা সপিন্ড পাত্রীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই ধরনের বিয়ে আগে কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষিত পরিবারে এই ধরনের বিয়ে হয়ে থাকে। এই বিয়েকে সাধারণত দানে বিয়ে বলে। এই বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুক দাবী করলে বিয়ের উপাদান নষ্ট হয়।

আসুর বিয়ে ঃ

গরীব নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অসুর বিবাহ কিছু কিছু প্রচলন দেখা যায়। এই প্রকার বিয়েতে কন্যার পিতা পাত্রের নিকট কন্যার মূল্য দাবী করত এবং বিবাহেচ্ছুক ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্য দিয়ে কন্যাকে পত্নীরুপে গ্রহণ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে মুসলিম পারিবারিক আইনে যেমন তালাকের বিধান রয়েছে, তেমনি হিন্দু আইনে তালাকের কোন বিধান নেই, কারণ মুসলিম বিবাহ সামাজিক ও আইনি চুক্তি আর হিন্দু বিবাহ ধর্মীয় বিধান যা অখন্ডনীয় কাজেই হিন্দু আইনে তালাক নিষিদ্ধ। তবে ভারতের সংবিধানে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন প্রণীত হয়েছে।

এসিড নিক্ষেপ

The poisins Act ১৯৯১ এর আওতায় এসিড বা বিষ জাতীয় দ্রব্যের মজুদ ও বিতরণ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ বিধান আছে। সরকার এ আইনের অধীনে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক এসব পদার্থ পাইকারী ও খুচরা বিক্রি এজন্য লাইসেন্স দিতে পারে। তা কোন শ্রেণীর লোকের কাছে বিক্রি হবে তাও নির্দিষ্ট করে দিতে পারবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা দু'জনার কাছে মেমো থাকতে হবে। এসব বিধি নিয়মমাফিক পালন হচ্ছে কিনা তার জন্য পরিদর্শক থাকার বিধান আছে।

এ আইন লংঘনকারীদের শাস্তি ঃ-

প্রথম অপরাধের জন্য ৫ শত টাকা জরিমানা ও তিন মাসের কারাদন্ড অথবা উভয় শাস্তি।

একই ব্যাক্তি দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে একবছরের কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা।

এসিড নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে আইন ঃ-

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০, অনুসারে দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি নিম্নরুপ ঃ-

১. যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত এক লাখ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

২. শিশু বা নারীর দৃষ্টি শক্তি বা শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অঙ্গ, গ্রন্থিবা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা শরীরের কোন স্থানে আহত হয় তাহলে (ক) উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লাখ টাকা অর্থ দন্ড। (খ) উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বছর কিন্তু অন্যূন ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

৩. যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি তার উক্তরুপ কার্যের দরুন সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারিরীক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে ক্ষতি না হলেও অনধিক ৭ বছর কিন্তু অন্যূন ৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

৪. এ ধারার অধীন অর্থ দন্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হতে বা তার বিদ্যমান সম্পদ বা তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া সম্পদ হতে আদায় করে অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে তার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্র মতে, যেই ব্যক্তি শারিরীক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে , তার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্র মতে, যেই ব্যক্তি শারিরীক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হবে।

পাচার

পাচার কি ?

কোন অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, ব্যাক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, দেশের মধ্যে অথবা একদেশ হইতে অন্যদেশে কোন নারী ও শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে জোর করে বা অর্থের বিনিময়ে স্থানান্তর করাকে পাচার বলে।

পাচার প্রতিরোধে করণীয় ঃ-

১. সরকারী ভাবে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা চালু ও সমবায় আন্দোলন সৃষ্টি করা।

২. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো।

৩. সরকারী প্রচার মাধ্যম সমূহে, পাচারকারী সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা, এ্যাডভোকেসী, কর্মশালা, সেমিনার, লিফলেট, বিল বোর্ড ইত্যাদি দেশের সর্বত্র আন্তরিকতার সাথে প্রচার করা।

৪. শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে পাচারের উপর বিশেষ গল্প / নিবন্ধ পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভূক্তি করা।

৫. সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে এতদ প্রসংগে কর্মশালার মাধ্যমে সমন্বিত কাজের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. বর্ডার বেল্ট এরিয়ায় GO ও NGO সমন্বিত প্রচেষ্টায় ট্রাফিকিং রিডিউস ওয়াচ কমিটি গঠন করা।

৭. দারিদ্রতা নিরসনের বহুমূখী প্রকল্প হাতে নেওয়া।

৮. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা।

৯. NGO পর্যায়ে নেট ওয়ার্কিং অথবা ফেডারেশন গঠন করা।

১০. প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম এর ব্যবস্থা করে মানুষকে সচেতন করে তোলা।

১১. পারিবারিক অশান্তি দুর করা।

১২. নিজ নিজ বাচ্চাদের নাম, ঠিকানা, পিতা মাতার নাম, মামা/চাচার নাম মুখস্ত করানো।

১৩. অন্যের কাছ থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করা।

১৪. একা একা অন্ধকারে কোন গলি বা অপরিচিত এলাকায় না যাওয়া।

পাচার হয়ে যাওয়ার পরে করণীয় কি ?

পাচার হয়ে গেছে সন্তানকে পাওয়া যাচ্ছে না, যখনই জানা যাবে, সাথে সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করে জেনারেল ডায়েরী করা। স্থানীয়ভাবে বেসরকারী সংস্থা সমূহের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা, সম্ভব হলে পত্রিকায় নিউজ ছাপানো বা মাইকিং করা। দ্রুত আত্মীয় স্বজনের বাড়ী সংবাদ নেওয়া, হাসপতালে খোজ খবর নেওয়া।

পাচার বর্তমানে একটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে সমাজের সবশ্রেণীর মানুষকে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিদের, তাদের লেখনী শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি সমাজ হিতৈষী মানুষ রাজনীতিবীদ, সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থাকে যৌথভাবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কাজ করতে হবে। কেননা মানুষ পন্য নয়, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।

আর মানুষই মানুষের জন্য কাজ করতে পারে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

নারী ও শিশু পাচারের ধারা ঃ ৫, ৬।

৫। নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি ঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেনবা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন, বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হউলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যুন দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্ত করিয়াছেন তিনি, ভিন্নরুপ প্রমানিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে কোন নারীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন তাহা হইলে তিনি, ভিন্নরুপ প্রমানিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬। শিশু পাচার, ইত্যাদি শাস্তি ঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্য কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হইতে চুরি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধর্ষণ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা চৌদ্দে বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধারা ঃ- ৯

ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি ঃ

(১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যুন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যুন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;

খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যুন পাঁচ বৎসর সশ্রম করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হোন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যুন পাঁচ বৎসর সশ্রম করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যুন দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫

ধারা - ৬

ধর্ষণের শাস্তি ঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে অথবা নারীকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি ধর্ষণ করিয়া কোন শিশুকে অথবা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ধর্ষণ করার পর কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন শিশু বা নারীকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করিয়া কোন শিশুকে অথবা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ধর্ষণ করার পর কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা-৭

ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টার শাস্তি ঃ

যদি কোন ব্যক্তি ধর্ষণ করিয়া কোন শিশু অথবা নারীর মৃত্যু ঘটাইতে বা আহত করিতে চেষ্ট করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

যৌতুক

'যৌতুক শব্দটি' ব্যাপকার্থে গ্রহণীয়। ইহার মধ্যে অর্থ সম্পদ ছাড়াও বিবাহের পর শ্বশুরের খরচে জামাইকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। কিংবা বিদেশে চাকুরীতে পাঠানো অথবা স্বদেশে চাকুরী প্রদান অর্ন্তভূক্ত করে। যৌতুক কেবল নগদ অর্থ কিংবা গাড়ী-বাড়ি ইত্যাদির মধ্যে সীমিত নহে।

বিবাহের সময় বা বিবাহের পূর্বে বা পরে বিবাহের প্রতিদানস্বরুপ যে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিতে সম্মতি অথবা প্রদত্ত বা গৃহীত কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে যৌতুক বলে।

১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ২ ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয়েছে ৫০০/- টাকার উপর কিম্বা অনুরুপ মূল্যমানের কোন সম্পদ বা উপহার আদান প্রদানকে চাপ সৃষ্টি করিয়া এক পক্ষ অন্যপক্ষের নিকট হতে গ্রহণ করাকে যৌতুক বলে গণ্য হবে। ইহা বিবাহের পূর্বে, বিবাহের সময় এবং বিবাহের পরে হইতে পারে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

ধারা - ১১

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি ঃ

যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি -

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫

ধারা-১০

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি ঃ

(১) যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা-১১

যৌতুকের জন্য গুরুতর আহত করার শাস্তি ঃ

যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীকে গুরুতর আহত করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে যাহা ৫ বৎসরের কম হইবে না, দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

উত্তরাধিকার বলতে কি বুঝায় ?

একমাত্র কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আত্মীয় স্বজনদের যে অধিকার জন্মায় তাকে বলে উত্তরাধিকার। মৃত ব্যক্তি মহিলা বা পুরুষ যেই হোক একই নিয়মে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয় হবে।

উত্তরাধিকার বন্টনের নীতি

উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসাবে সম্পত্তিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো দেখতে হয় ঃ

- মৃত ব্যক্তির দাফনকাফনের খরচ
- মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ বা দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা
- স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা হয়েছে কি না
- মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কোন উইল করা থাকলে সেই উইলে উল্লিখিত সম্পত্তি প্রদানের পর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হবে।

উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিভাগ ঃ

কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পত্তিতে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যাদের উপর স্বত্ব বর্তাবে তাদেরই উত্তরাধিকার বা ওয়ারিশ বলে। মুসলিম আইনের বিধান মতে উত্তরাধিকারীদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ

১. কোরানিক অংশিদার
২. অবশিষ্ট ভোগী
৩. দূরবর্তী আত্মীয়গণ

কোরানিক অংশিদার ঃ

যে সকল ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে কোরানে বর্ণিত নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকারী তারাই কোরানিক অংশীদার।

অবশিষ্ট ভোগী ঃ

যে উত্তরাধিকারীদের সাথে মৃত ব্যক্তির রক্তের সম্পর্ক আছে এবং কোরানে বর্ণিত অংশীদারদের সম্পত্তি দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তিতে যারা হকদার তারাই অবশিষ্ট ভোগী।

দূরবর্তী আত্মীয়গণ ঃ

মৃত ব্যক্তির কোন কোরানিক অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী না থাকলে যারা সম্পত্তি পান তারাই হলেন দূরবর্তী আত্মীয়গণ।

প্রধান উত্তরাধিকার বা অংশীদার

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি মূলত: পাঁচজন উত্তরাধিকারীর মাঝে ভাগ হয় ঃ-

১. পিতা

২. মাতা

৩. স্ত্রী/স্বামী

৪. মেয়ে

৫. ছেলে

স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী ও স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামী সম্পত্তি পাবে, বাকি চারজন সব সময়ই পাবে। উল্লিখিত পাঁচজন ছাড়া আরো ৭ জন অংশীদার আছেন। কিন্তু তারা প্রধান অংশীদার থাকলে- সম্পত্তি পায় না। তারা হলেন –

১. দাদা = $\frac{১}{৬}$

২.দাদি/নানি = $\frac{১}{৬}$

৩. ছেলে মেয়ে বা নাতনী = $\frac{১}{২}$,দুই বা তার বেশি মেয়ে = $\frac{২}{৩}$

৪. আপন বোন = $\frac{১}{২}$,দুই বা তার বেশি আপন বোন = $\frac{২}{৩}$

৫. বৈপিত্রেয় বোন = $\frac{১}{৬}$, দুই বা তার বেশি বৈপিত্রেয় বোন = $\frac{১}{৩}$

৬. বৈপিত্রেয় ভাই = $\frac{১}{৬}$, দুই বা তার বেশি বৈপিত্রেয় ভাই = $\frac{১}{৩}$

৭. বৈমাত্রেয় বোন = $\frac{১}{২}$, দুই বা তার বেশি বৈমাত্রেয় বোন = $\frac{২}{৩}$

পিতা ঃ

সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে পিতার তিন অবস্থা

ক. মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পুত্রের পুত্র বা তার নিচে কেউ থাকলেও পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পত্তি পায়।

খ. পুত্র না থেকে কন্যা থাকলে বা তার নিচে কেউ থাকলেও পিত $\frac{১}{৬}$ অংশ সম্পত্তি পায় এবং অবশিষ্ট সম্পত্তিও তিনিই পাবেন।

গ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে তার পিতা অবশি ভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়।

মাতা ঃ

উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে মাতার তিন অবস্থা হতে পারে ঃ

ক. যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান বা পুত্রের সন্তান যতই নিচের দিকে হোক না কেন অথবা মৃত ব্যক্তির আপন বা বৈপিত্রেয দই বা ততোধিক ভাই কিংবা বোন থাকে এমনকি যদি শুধু একজন ভাই ও একবোন থাকে তবে মাতা মৃতের সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ পান।

খ. যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি বা পুত্রের সন্তানগণ যত নিচের দিকেই হোক না থাকে এবং একজনের বেশি বোন বা ভাই না থাকে সেক্ষেত্রে মা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন।

গ. মাতার সাথে মৃত ব্যক্তির পিতা থাকলে এবং স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকলে স্বামী বা স্ত্রীকে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তার $\frac{১}{৬}$ অংশ মা পাবে।

স্ত্রী ঃ

স্ত্রী দুইভাবে উত্তরাধিকারিনী হয় ঃ

ক. মৃত স্বামীর কোন সন্তান বা ছেলের সন্তান যত নিচেরই হোক, না থাকলে বিধবা স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ পায়।

খ. যদি স্বামীর সন্তান বা ছেলের সন্তান যত নিচেরই হোক, থাকে তবে স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ সম্পত্তি পায়।

স্বামী ঃ

স্বামী দুইভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

ক. মৃত স্ত্রীর সন্তান বা সন্তানের সন্তান যত নিচেরই হোক না কেন, না থাকলে স্বামী ঐ স্ত্রীর সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

খ. মৃত স্ত্রীর সন্তানাদি থাকলে তাহলে স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পায়।

মেয়ে ঃ

সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে মেয়ের তিন অবস্থা হতে পারে-

ক. একজন কন্যার অংশ $\frac{১}{২}$ (পুত্র না থাকলে)

খ. দুই বা ততোধিক কন্যার অংশ $\frac{১}{২}$ (পুত্র না থাকলে)

গ. পুত্র থাকলে কন্যা বা কন্যাগণ অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়।

কোরানিক অংশীদার হিসেবে কন্যার অংশ যদিও নির্দিষ্ট আছে কিন্তু যখনই পুত্র ও কন্যা একসাথে থাকে তখনই কন্যা একসাথে থাকে তখনই কন্যা পুত্রের সাথে অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়।

ছেলে ঃ

ছেলে সবসময়ই অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে। মৃত ব্যক্তির একাধিক ছেলে থাকলে সব ছেলেই সমান অংশ পায়।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। পারিবারিক বিষয়সমূহ যেমন- বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, ভরণ-পোষণ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে এই আদালত মামলা পরিচালনা করে। নারী সমাজের পারিবারিক বিষয়াদি দ্রুত নিস্পত্তির জন্য একটি স্থানীয় ও পৃথক বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন থেকেই এই আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য ঃ

পারিবারিক আদালত গঠনের দাবি এদেশের নারী সমাজের দীর্ঘ দিনের। এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন, ঘোষণা এবং প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদের দাবি কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত এবং কার্যকর হয়েছে। নারী সমাজের এবং বিশেষ করে পারিবারিক কিছু জটিল সমস্যা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে এর সমাধান আদালতের আশ্রয় ছাড়া সম্ভব নয়। দেশের প্রচলিত জটিল এবং ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষে বিচার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য আলাদা কোন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। অথচ এর প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। যে সব সমস্যা পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সে সব সমস্যা নিরসনকল্পে অল্প সময়ে, অল্প খরচে এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে পারিবারিক ও নারী সমাজের পারিবারিক বিষয়াদি নিস্পত্তির জন্য একটি স্থায়ী ও পৃথক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই এ অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের প্রচলিত পারিবারিক আদালত সমূহ হিন্দু স্ত্রীর স্বামীর নিকট থেকে পৃথকভাবে বসবাস, ভরণপোষণ, সন্তানের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার এবং সন্তানের ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিচার করে থাকে।

যেহেতু হিন্দু পারিবারিক আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না এবং হিন্দু স্ত্রী দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী নয় সে কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং দেনমোহরের বিষয় সম্পর্কে কোন সমস্যা হিন্দু সমাজে উদ্ভূত হওয়ার কথা নয়। তবে কোনদিন হিন্দু সমাজে এই ব্যবস্থাগুলো প্রচলিত হলে বর্তমান আইনের বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য হবে।

পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার ঃ

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে পারিবারিক আদালতের নিম্নলিখিত ৫টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বা ঐ বিষয়গুলো হতে উদ্ভূত মামলা গ্রহণ, বিচার এবং নিস্পত্তি করার ও অন্যান্য এখতিয়ার থাকবে, যেমন-

ক. বিবাহ-বিচ্ছেদ
খ. দম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার
গ. দেনমোহর
ঘ. খোরপোষ
ঙ. শিশু সন্তানের অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধান ও খোরপোষ

এ বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত বা এ বিষয়গুলো হতে উদ্ভূত কোন মামলা অন্য কোন আদালতে বিচারের আওতাভূক্ত হবে না। পারিবারিক আদালত গঠনের পূর্বে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের মামলা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচার নিস্পত্তি হতো। কিন্তু বর্তমানে ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার এই আইন (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ) দ্বারা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। পূর্বে অভিভাবক ও প্রতিপালন আইনের (গার্জিয়ান এন্ড ওয়ার্ডর্স অ্যাক্ট) বিষয়গুলো জেলা জজ নিস্পত্তি করতেন। বর্তমানে এই বিষয় পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারে রয়েছে।

পক্ষসমূহের অনুপস্থিতির ফলাফল ঃ

১. বিবাদি হাজির হওয়ার নির্দিষ্ট দিনে মামলা শুনানির সময় কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকলে আদালত মামলাটি খারিজ করে দিতে পারেন।

২. মামলা শুনানির সময় বাদি হাজির হলে এবং বিবাদি হাজির না হলে-

ক. যদি প্রমানিত হয় যে সমন বা নোটিশ বিবাদির ওপর যথাযথ জারি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আদালত একতরফা ভাবে অগ্রসর হতে পারেন;

খ. সমন নোটিশ বিবাদির ওপর যথাযথ ভাবে জারি হয়েছে প্রমাণিত না হলে, আদালত বিবাদির ওপর নতুন করে সমন বা নোটিশ প্রেরণ ও জারি করার নির্দেশ দিবেন।;

গ. যদি এই প্রমাণিত হয় যে, বিবাদির উপস্থিতির জন্য ধার্য দিনে তার পক্ষে উপস্থিত হতে ও জবাব দিতে সমর্থ হওয়ার মতো যথেষ্ট সময় না দিয়ে তার প্রতি সমন ও নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তা হলে আদালত তৎকর্তৃক (অনধিক একুশ দিনের জন্য) নির্ধারিত কোন আগামী দিন পর্যন্ত শুনানি স্থগিত রাখবেন এবং বিবাদিকে উক্ত দিন সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করবেন।

৩. আদালত কর্তৃক কোন মোকদ্দমার একতরফা শুনানি মুলতবি থাকলে এবং বিবাদি হাজিরার নির্ধারিত তারিখে বা তৎপূর্বে আদালতে হাজির হয়ে এর পূর্বে গরহাজির থাকার গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শালে আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করেন সেরকম শর্তে পূর্বের ধার্যকৃত দিনে বিবাদি হাজির হলে যেভাবে শুনানি গ্রহণ করতেন, অনুরূপভাবেই বিবাদির জবাবে শুনানি গ্রহণ করতে পারেন।

৪. মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হলে বিবাদি পক্ষ হাজির এবং বাদিপক্ষ গরহাজির থাকলে বিবাদি বাদির সম্পূর্ণ বা আংশিক দাবি স্বীকার না করলে আদালত মামলাটি খারিজ করবেন। বিবাদি বাদির দাবি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে স্বীকার করলে আদালত বিবাদির স্বীকৃতি অনুযায়ী বিবাদির বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করবেন এবং অবশিষ্ট দাবি বাবদ আমলাটি খারিজ হবে।

৫. কোনমামলা দু'পক্ষের অনুপস্থিতিতেই খারিজ হলে কিংবা বিবাদির স্বীকৃতি অনুসারে সম্পূর্ণ বা আংশিক খারিজ হলে ত্রিশ দিনের মধ্যে হুকুমদানকারী আদালতে খারিজ হুকুমটি রদ করার জন্য বাদি আবেদন করতে পারেন এবং তিনি যদি আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে মামলাটি শুনানির জন্য ডাকার সময়ে তার গরহাজির থাকার সঙ্গত কারণ ছিল, সে ক্ষেত্রে আদালত খারিজের হুকুমটি বাতিলের আদেশ দান করবেন এবং মামলাটি নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য একটি দিন ধার্য করবেন।

৬. কোন বিবাদির বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি প্রদত্ত হলে, ডিক্রি প্রদানের তারিখ হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিবাদি তা রদ করার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং তিনি যদি এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করেন যে সময় মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল তখন তার (বিবাদির) গরহাজির *থাকার যথে* কারণ ছিল, সেক্ষেত্রে আদালত বিবাদির বিরুদ্ধে প্রদত্ত একতরফা ডিক্রি বাতিলের আদেশ প্রদান করবেন এবং মামলাটি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি দিন ধার্য করবেন।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার ঃ

পারিবারিক আদালত উপযুক্ত মনে করলে এই অধ্যাদেশের অধীনে মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পূর্ণ বা যে-কোন অংশ রুদ্ধকক্ষে অনুষ্ঠিত করতে পারেন।

যে বিষয়সমূহ নিয়ে পারিবারিক আদালতে বিচারকার্য পরিচালিত হয়, সেই বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির এবং সেই ভিন্ন প্রকৃতির কারণে পারিবারিক আদালতের বিচার ভিন্ন অবস্থায় হতে পারে। স্বামীর সাথে স্ত্রী, স্ত্রীর সাথে স্বামীর বা সন্তানের সাথে পিতামাতার বিরোধ অনেক সময় জন সম্মুক্ষে প্রকাশ করা বিব্রতকর হয়ে পড়ে। এ সমস্ত কারণে আইন এই মামলা রুদ্ধকক্ষে বিচারের ব্যবস্থা রেখেছে।

আপোস বা পুনর্মিলনের জন্য আদালত খাস কামরায় উভয় পক্ষকে বা যে-কোন পক্ষকে ডেকে চেষ্টা করতে পারেন অথবা আদালত কোন মহিলা স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য খাস কামরায় গ্রহণ করতে পারেন। আদালত নিজের ইচ্ছাই রুদ্ধদ্বার কক্ষে বা খাস কামরায় বিচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন না। এজন্য আদালতকে উভয় পক্ষ কর্তৃক অনুরোধ করতে হবে। পক্ষগণ আদালতের কাছে আবেদন না করলে আদালত খাস কামরায় সাক্ষ্য গহেণ করতে পারবেন না।

পারিবারিক আদালতের অবমাননা ঃ

কোন ব্যক্তি পারিবারিক আদালত অবমাননার দোষে দোষী হবে, যদি আইন সঙ্গত অজুহাত ছাড়া-

ক. পারিবারিক আদালতকে কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন;

খ. পারিবারিক আদালতের কাজে কোন বিঘ্ন ঘটান;

গ. যে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য, সেরুপ কোন প্রশ্ন পারিবারিক আদালত কর্তৃক উত্থাপিত হলে তার উত্তর দিতে অস্বীকার করেন;

ঘ. পারিবারিক আদালতে কোন সত্য বর্ণনা করার জন্য শপথ নিতে বা এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নিজ বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকার করেন।

পারিবারিক আদালত তৎক্ষণাৎ আদালত অবমাননার দায়ে উক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারেন এবং তাকে অনধিক দু'শত টাকা জরিমানা করতে পারেন।

কোর্ট ফি ঃ

পারিবারিক আদালতে মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে আর্জি দাখিলের জন্য কোর্ট ফি ৩০ টাকা, মামলার প্রসেস ফি ২ টাকা, ওকালতনামার জন্য ৫ টাকা এবং ডাকমাসুলের জন্য ৮ টাকা, মোট ৪৫ টাকা ফি দিয়ে মামলা দায়ের করা হয়।

পারিবারিক আদালতের সকল প্রকার মামলায় ৪৫ টাকা কোর্ট ফি দিতে হয়। ১ লক্ষ টাকা দেনমোহর আদায়ের মামলাতে কোর্ট ফি ৪৫ টাকা আবার ১০ হাজার টাকার দেনমোহর আদায়ের মামলাতেও কোর্ট ফি ৪৫ টাকা।

অপহরণ

যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হইতে গমন করিবার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করে বা কোন প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপহরণ করে বলে গন্য হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

ধারা- ৭

নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি ঃ

যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বে-আইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অন্যূন্য চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অন্যুন ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫

ধারা-৯

বে-আইনী বা নীতিবিগর্হিত, ইত্যাদি কাজে ব্যবহারেরউদ্দেশ্যে অপহরণের শাস্তি ঃ

যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে-

ক. পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোন বে-আইনী বা নীতিবিগর্হিত কাজে নিয়োজিত বা ব্যবহার করার,

খ. তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য করার, বা

গ. বলপ্রয়োগ করিয়া বা প্রলুব্ধ করিয় বা ফুসলাইয়া যৌন সংগম করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১০ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে যাহা ৭ বৎসরের কম হইবে না, দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

দন্ডবিধি ১৮৬০

ধারা-৩৬৪

খুন করিবার উদ্দেশ্যে মনুষ্য হরণ কিংবা অপহরণ ঃ

যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে, এইরুপ উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করে যাহাতে অনুরুপ ব্যক্তি খুন হইতে পারে বা তাহার এইরুপ ব্যবস্থাপনা হইতে পারে, যাহাতে সে খুনের বিপদ কবলিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা সশ্রম কারাদন্ডে - যাহার মেয়াদ ১০ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে - দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা - ৩৬৪ - ক

দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করা ঃ

যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে খুন করা যাইতে পারে, কিংবা তাহাকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তি কাম-লালসার বশে আনা যাইতে পারে, অথবা যাহার এইরুপ ব্যবস্থাপনা করা যাইতে পারে যে তাহার খুন হইবার কিংবা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইবার বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির কাম-লালসার বশীভূত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারা দন্ডে বা সশ্রম কারাদন্ডে - যাহার মেয়াদ ১৪ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে - দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা-৩৬৫

কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অবৈধভাবে অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ ঃ

যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে, গোপনভাবে ও অবৈধভাবে অবরোধ করাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে -যাহার মেয়াদ ৭ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে -দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা-৩৬৬

কোন নারীকে বিবাহ ইত্যাদিতে বাধ্য করিবার নিমিত্তে অপহরণ, হরণ বা প্রলুব্ধকরণ ঃ

যে ব্যক্তি, কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে এইরুপ অভিপ্রায়ে বা তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়াকিংবা তাহাকে অবৈধ যৌনসহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অথবা তাহাকে অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে - যাহার মেয়াদ ১০ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে - দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে; এবং যে ব্যক্তি কোন নারীকে এই বিধিতে বর্ণিত অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সাহায্যে বা বাধ্যবাধকতার অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে অথবা তাহাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে জানিয়া তাহাকে কোন স্থান হইতে গমন করিতে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তিও পূর্বোক্তবৎ দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৬৭

কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্বাধীন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ ঃ

যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে, এইরুপ উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তির অধীন করা যাইতে পারে, কিংবা তাহার এইরুপ ব্যবস্থাপনা হইতে পারে যে তাহাকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তির অধীন করা যাইতে পারে, অথবা এইরুপ জানিয়া তাহাকে অপহরণ বা হরণকরে যে উক্ত ব্যক্তিকে বশে আনা বা তাহা অনুরূপ ব্যবস্থাপনা করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে - যাহার মেয়াদ ১০ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে - দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে।

ধারা-৩৬৮

অপহৃত বা হরণকৃত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করা ঃ

যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করা হইয়াছে জানিয়া অনুরুপ ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করে, সেই ব্যক্তি একই প্রণালীতে এইরুপে দন্ডিত হইবে যেন সে উক্ত ব্যক্তিকে তদ্রুপ একই অভিপ্রায় বা অবগতি সহকারে বা তদ্রুপ একই উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করিয়াছিল যদ্রুপ অভিপ্রায় বা অবগতি সহকারে অথবা উদ্দেশ্যে সে অনুরূপ ব্যক্তিকে অবরোধ, গোপন বা আটক করে।

ধারা-৩৬৯

দেহাভরণ চুরি করিবার অভিপ্রায় দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অপহরণ বা হরণ করা ঃ

যে ব্যক্তি দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুর দেহ হইতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে ছিনাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে অনুরূপ শিশুকে অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে - যাহার মেয়াদ ৭ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে - দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে।

স্ত্রীর ভরণপোষণ

স্বামীর কর্তব্য ঃ

যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিবে এবং তাহার ন্যায় সংগত আদেশ পালন করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার পোষণ করিতে বাধ্য থাকিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে, যদি স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত দাম্পত্য অসহযোগ করে বা স্বামীর প্রতি অনুগত না হয় তাহা হইলে স্বামী তাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নহে। অবশ্য চাহিবামাত্র দেয় মোহরানা স্ত্রীর তলবমত স্বামী যদি আদায় না করে তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর সহিত দাম্পত্য অসহযোগ করিতে ও আনুগত্য শিথিল করিতে পারে।

তালাকান্তের ভরণপোষণ ঃ

তালাকের পর ইদ্দত কাল পর্যন্ত স্ত্রী ভরণপোষণ পাইতে পারে। কিন্তু ইদ্দতকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর যদি তালাকের সংবাদ স্ত্রীর নিকট পৌছায় তাহা হইলে ঐ সংবাদ পৌছানোর দিন পর্যন্ত ভরণপোষণ পাইবে। স্বামীর মৃত্যুর পর যে ইদ্দত পালন করিতে হয় সেই ইদ্দতের সময়ের জন্য স্ত্রী কোন ভরণপোষণপাইবে না।

ভবিষ্যত ভরণপোষণ ঃ

মুসলিম আইনে ভরণপোষণ বলিতে জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থানকে বুঝায়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের পূর্বে বা পরে ভবিষ্যত কোনও সময় বিবাহ বিচ্ছেদ করার জন্য যদি কোন চুক্তি করা হয় তাহা বে-আইনী ও নীতি বিরুদ্ধ। তজ্জন্য ভবিষ্যতে বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত কোন নির্দিষ্ট পরিমান ভরণপোষন দেয়ার চুক্তিও বে-আইনি ও নীতি বিরুদ্ধ।

কোন সুস্পষ্ট চুক্তি ব্যতিরেকে বিবাহ অবর্তমানে স্ত্রী আজীবন ভরণপোষণ পাইতে পারে না। উপরোক্ত ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য নীতিগত কারণে ভবিষ্যত ভরণপোষণের চুক্তি আইনতঃ গ্রহণযোগ্য।

একজন স্ত্রী তাহার স্বামীর নিকট হইতে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারিনী, তবে স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর অনুগত থাকিতে হইবে।

সংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর নিকট বসবাস করিতে অস্বীকার করিলে বা তাহার প্রতি অবাধ্য হইলে স্বামী ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নহেন। সংগত কারণ বলিতে আশু দেনমোহর আদায় না করা, স্ত্রীকে নির্যাতন করা, অবহেলা করা বা স্বামীর নিষ্ঠুরতাকে বুঝায়।

যক্তি সংগত কারণ ছাড়া স্বামী স্ত্রীর প্রতি প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিলে অথবা ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করিলে স্ত্রী ভরণপোষণের জন্য মামলা করিতে পারেন।

যদি কোন স্ত্রীকে তাহার স্বামী প্রয়োজনীয়রূপ খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে স্ত্রীর অন্য কোন আইনানুগ প্রার্থনা করা ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে পারেন। তিনি সালিসী পরিষদ গঠন করিয়া স্বামী কর্তৃক খোরপোষের টাকার পরিমান নির্দিষ্ট করিয়া প্রত্যয়ন পত্র জারি করিতে পারনে।

প্রয়োজনে স্বামী বা স্ত্রী পারিবারিক আদালতে উক্ত প্রত্যয়ন পত্রের রিভেশনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেনএবং পারিবারিক আদলতের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য এবং কোন আদালতে এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

সন্তান এবং বংশধরগণের ভরণপোষণঃ যতদিন পর্যন্ত পুত্র সন্তান বালেগ না হয় এবং কন্যা সন্তান বিবাহিতা না হয় ততদিন পর্যন্ত পিতা তাহাকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। যে মেয়ে বিধবা হইয়াছে বা তালাকপ্রাপ্তা হইয়াছে সেই মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্বও পিতার।

আদালতের মাধ্যমে ভরণপোষণ আদায়ের ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ জারী করা হইয়াছে এবং ১৫-৬-৮৫ খ্রীঃ হইতে উহা কার্যকর করা হইয়াছে। তদ্বারা আইনতঃ প্রতিকার পাওয়ার সহজ ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ের প্রক্রিয়া চালু করা হইয়াছে। সাধারণ দেওয়ানী আদলতের এখতিয়ার রহিত করা হইয়াছে। (উহার ৩ ও ৫ ধারা দ্রষ্টব্য)

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আইনদ্বারা ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারার কার্যকারিতা লোপ করা হইয়াছে।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশকে ১৯৮৫ এর ২৩ ধারা, ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশকে রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং কোন যুক্তি সংগত কারণ ছাড়া যদি স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহণ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করে তাহা হইলে যে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই সময়ের জন্য স্ত্রী ভরণপোষণ দাবী করিতে পারিবে না।

সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য

জেন্ডার কি ?

নারী ও পুরুষকে আলাদা চোখে না দেখে উভয়ই মানুষ, এই দৃষ্টি ভংগিতে নারীকে মূল্যায়ন করা এবং উন্নয়নে সকলে সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এই বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো জেন্ডার।

একমাত্র আদিম যুগেই আমরা দেখেছি নারী পুরুষ একত্রে সহ অবস্থান করে সকল প্রকার উৎপাদন কাজে জড়িত থেকে সমান ভাবে খাদ্যদ্রব্য ভোগ করতো। মূলত তখন তাদের শত্রু বলতে ছিল প্রকৃতি। কিন্তু সময়ের আবর্তনে যখনই উৎপাদন ব্যবস্থা হতে নারীকে দুরে সরিয়ে রেখে, শুধুমাত্র পুরুষরাই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত হয়ে পড়লো তখনই নারীরা হলো গৃহবন্দী। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন মতবাদ, মতবাদ, ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার নারীকে আরও শোষন করার জন্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো।

সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার সমূহ ঃ

১. নারীরা অবলা
২. নারীদের বুদ্ধি কম
৩. নারীরা পুরুষদের বাম পাজড়ের হাড় দ্বারা তৈরী।
৪. নারীরা দৈহিক ভাবে দুর্বল
৫. নারীরা হিংসুটে, ঝগড়াটে
৬. নারীরা পুরুষদের শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী
৭. বিশেষ সময়ে নারীরা অসুচী বা অপবিত্র থাকে
৮. নারীরা জন্ম মাত্রই বন্দী, ছোটকালে বাবা-মার অধীনে, বিবাহের পরে- স্বামীর অধীন, স্বামীর মৃত্যুর পর ভাইয়ের বা আত্মীয় স্বজনের অধীন, নারী কখনও স্বাধীন হয় নয়।

* এসব ভুল ধরনার বশবর্তী হয়ে নারীদের সব সময় সমাজ ও জাতীয় উন্নমূলক কর্মকান্ড থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি নারীকে উচ্চ শিক্ষার পথ থেকেও দুরে রাখা হয়েছে।

নারীদের সমস্যা সমূহ ঃ

আমাদের দেশ দরিদ্র দেশ, নারী পুরুষ শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমভাবে অংশগ্রহণ করলেও মজুরী বৈষম্যের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এরই পাশাপাশি- **নারীকে ঃ** *সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়না, *রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারে না, সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে না, নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা নাই, পারিবারিক প্রতিবন্ধীকতা কাজ করে, ধর্মীয় বাধা আসে, ফতোয়াবাজের শিকার হয়, শিশু কাল থেকেই নারী ও পুরুষ হিসাবে ভাবা হয়, কাজের ক্ষেত্র আলাদা করে দেওয়া হয়।

অথচ ছেলে ও মেয়েকে আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে উভয়কে যদি সমান চোকে দেখে, সমান সুযোগ তৈরী করে দেওয়া হয় তাহলে নারী পুরুষ হিসাবে নয় উভয়ই মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে এবং উভয়ই পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নে পদক্ষেপ/ ভুমিকা রাখতে পারে এক্ষেত্রে বলা চলে বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটিই নারী এদের উন্নয়নের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে রেখে জাতীয় উন্নয়ন আশা করা যায়না।

নারীর দারিদ্র দুরীকরণ ঃ

- দরিদ্র নারী শ্রম শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করেও প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মুল ধারায় সম্পৃক্ত করা।
- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা বিনোদন সহ নারীর সকল চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপি শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সহ ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রনের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রযোজনীয় নতুন আইন প্রনয়ন করা।

করণীয় সমূহ ঃ

সকল প্রকার ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, ভুল মতবাদ দুর করে, নারীকে শিক্ষা ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সমান ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং তৈরী করে নেওয়া।

উপসংহার ঃ দৃষ্টি ভংগির পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীকে নারী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে দেখা।

তথ্য সূত্র ঃ নারী ও শিশ নির্যাতন দমন আইন এবং যৌতুক নিরোধ আইন - ছিদ্দিকুর রহমান। পারিবারিক আদালত ও বিচার পদ্ধতি - মোঃ আব্দুস সালেক। আইন সহায়িকা ও সালিস কার্য পদ্ধতি - মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন - ২০০০ একটি পর্যালোচনা - নারী পক্ষ। আইনের কথা - আইন ও সালিশ কেন্দ্র।